বিত্তি জাখোই কুঁড়া পলুই : মাছ ধরার লোকযন্ত্র তৈরীর মহিলাকুল

শত শত নদী-উপনদী-শাখানদী বিধৌত আমাদের বঙ্গদেশ। যার অঙ্গে অঙ্গে খাল বিল নালা। সেসব জলস্রোতে মাছ শিকার বাঙালির জন্মগত অভ্যেস। বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনেও অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে মাছ। বর্ষায় জল এলে আমাদের খালেবিলে খেলা করে ছোট ছোট মাছ। জলাশয়ে খালের ধারে পাতা হয় লোকযন্ত্র। তাতে ধরা পরে মাছ। মাথায় বর্ষাতি নিয়ে পাতা হয় হাতে বোনা লোকযন্ত্র। নালা বা খালের ধারে বিশেষ কায়দায় জলপ্রবাহকে ব্যবহার করা হয়, মাছ ধরার জন্য। জলের উজান স্রোতে মাছ ছুটে গেলে তারা ধরা পরে লোকযন্ত্রে। তারপর সেই যন্ত্র থেকে মাছ সংগ্রহ করা হয়। নালা খাল বিলের যেদিকে জল বয়ে যায় সেই মুখে পাতা হয় ওই লোকযন্ত্র। উজানে বইতে গিয়ে ওই যন্ত্রে তারা ঢুকে পরে। নৌকা ট্রলার জাল দিয়ে যেভাবে মাছ ধরা হয়, এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকযন্ত্র ব্যবহার করে মাছ শিকারের ইতিহাসও বহু পুরনো। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় এভাবে মাছ ধরার প্রচলন আজও চলে আসছে। আবার

এই কৌশলে মাছ ধরতে গেলে যেসব লোকযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা কিছু কিছু গ্রামে আজও তৈরী হয়। এতে নারী পুরুষ উভয়ে হাত লাগাই। পার্বত্য অঞ্চলে, সমতলে, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এসব লোকযন্ত্র পেতে মাছ ধরে বহু মানুষ।

বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার কিছু কিছু গ্রামে বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হয় ওসব লোকযন্ত্র। বাঁধনের জন্য ব্যবহার করা হয় তালপাতার নিচের শক্ত অংশের ছাল। কখনও জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা হয় শ্যামলতা। তালপাতার নিচের ওই অংশ বেশ শক্ত। আবার শ্যামলতা দিয়ে বাঁধন দিলে তা বেশ টেকশই হয়। জলে পচে যায় না। তবে ওসব লোকযন্ত্রে বাঁধন দিতে এখন ব্যবহার করা হয় বাজারে প্রাপ্ত প্লাস্টিক দড়ি। খাল বিল থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বাংলার গ্রামে গ্রামে তৈরী করা হয় বিত্তি। বিত্তিকে স্থান বিশেষে বলা হয় ডানকুনি, খুলশুন প্রভৃতি। আবার যেখানে বিত্তি বা ডানকুনি পাতা হয় সেই জায়গাকে বলা হয় আরা বা আংটি। নালা খালের ধারে আরা বা আংটি পাতা হয়। ওখানেই পুঁতে দেওয়া হয় বিত্তি বা খুলশুন। মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া বা জলঙ্গীর সমীপে দেবীপুর এলাকায় আজও তৈরী করা হয় মাছ ধরার নানা লোকযন্ত্র। যে কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীরা সমানতালে হাত লাগায়। ডাহাপাড়ার বিউটি সরকার, আরতী সরকার, বিভা সরকার, নিয়তি সরকার (৬৩), বুলু সরকার বা ক্লাস টুয়েল্ভে পাঠরতা সাথী সরকার, পূজা সরকার (VIII), লিপিকা সরকারের (VIII) মতো পাঠরতা (স্কুলের নাম:- ডাহাপাড়া বন্ধুকুঞ্জ আদিবাসী শিক্ষা নিকেতন) মেয়েরাও একাজটি করতে পারে। এরা তপশিলী। ছোট ছোট টালির ঘরে এদের বাস। এলাকায় প্রায় ১২০টিরও বেশি পরিবার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এটাই ওদের মূল জীবিকা। জৈষ্ঠ্য থেকে আশ্বীন মাস অবধি ওরা বিত্তি বোনে। বিত্তি ছাড়াও বোনা হয় জাখোই, পলুই, কুড়া, বড়ি দেওয়া চাটা।

দেবীপুরেও এসব বোনাবুনির কাজ চলে। দেবীপুরের আরতী বাপের বাড়িতেও এসব কাজ করত। আরতির মতো বহু মহিলা আবার শ্বশুড়বাড়ি এসে কাজটি শিখেছে। যাদের কাজের অভিজ্ঞতা কারও কারও ত্রিশ বছরের। হাতের পারদর্শিতা দেখার মতো। বুননের গঠন সৌষ্ঠব অতি সুন্দর ও পারিপাট্যে ভরা। ষাটোর্দ্ধ নিয়তি সরকার বিত্তি বুনতে বুনতে বলছিল, এসব কাজ তারা বংশানুক্রমে শিখে নেয়। পরের প্রজন্মের মেয়েরাও এই কাজটি করবে যদি না সরকারি চাকরি পায়। এ কাজই তাদের পেটের খোরাক। এই কাজ কুটির শিল্প হিসাবে আজও মান্যতা পাইনি। তারাও শিল্পীর মর্যদা পায়নি বা পাইনি সরকারি/বেসরকারী কোনও সাহায্য। দূরদেশ থেকে তারা বাঁশ কিনে আনে। সেই বাঁশ থেকে তৈরী করা হয় বাঁশের ছোট ছোট খিল। আবার খিলের থেকে কিছুটা মোটা বাঁশের ফালিও বিত্তি বানাতে লাগে। যাকে বলা হয় পাত্তি। কয়েকটা খিলকে পর পর পাশাপাশি রেখে (মাদুরের মতো) বোনা হয় বা বাঁধা হয় (নিচের ছবি)। তারপর দেওয়া হয়

কয়েকটা পাত্তি। এভাবে খিল সাজিয়ে বেঁধে বেঁধে তৈরী করা হয় দীর্ঘ একটা খিলের সারি। যাকে খুট্যাও বলা হয়। এই খিল আর পাত্তির দীর্ঘ সারিকে আয়তঘন আকৃতি দেওয়া হয়। যার দৈর্ঘ্য কমবেশি চারফুট। প্রস্থ কমবেশি দশ ইঞ্চি। উচ্চতা এক থেকে দেড়ফুট। এভাবে আয়তঘন খিলের যে খাঁচাটা তৈরী করা হয় তাকে বলা হয় বিত্তি বা খুলশুন বা ডানকুনি। বিত্তির দুদিকে রাখা হয় মাছ ঢোকার জায়গা। যাকে বলা হয় ঘাই। ঘাই-এর সংখ্যা অনুসারে বিত্তির নানা নাম হয়। যে বিত্তিতে পাঁচটি ঘাই (মাছ ঢোকার স্থান) থাকে তাকে পাঁচ ঘাই বিত্তি বলে। তিনটি ঘাই থাকলে তিন ঘাই বিত্তি। চারটি থাকলে চার ঘাই বিত্তি বলা হয়। বিত্তি চারকোনা হলে তাকে কয়রা বলা হয়। তিনকোনা বিত্তি হলে তাকে বলে কুঁজি। বিত্তির গোড়া বা আগায় কতগুলো খিল বা পাত্তি থাকবে তারও হিসাব আছে। বিত্তির গোড়ায় সাধারণত চার পণ আট গণ্ডা খিল থাকে (৩৫২টি), আগায় থাকে চার পণ (৩২০টি)। আবার এসব সাধারণ বিত্তির সঙ্গে কুঁড়া বিত্তির পার্থক্য আছে। কুঁড়া বিত্তির আকারও আয়তঘন, বিত্তির মতো। বিত্তিতে থাকে চার পাঁচ বা তিনটি ঘাই। কুঁড়া বিত্তিতেও থাকে তিনটি বা চারটি ঘাই। কিন্তু এর সঙ্গে থাকে অতিরিক্ত দুটি মাছ ঢোকার জায়গা। যাকে কুঁড়া বলা হয়। যার আকার শঙ্কুর মতো। সামনের দিকের মুখ বড়ো, পিছনের দিকটা শঙ্কুর শীর্ষদেশের মতো। যে শঙ্কু আকৃতির কুঁড়ার মোটা মুখ দিয়ে মাছ চলে যায় বিত্তির ভিতরে। কুঁড়া বিত্তিতে থাকে নটা বাঁই আর পাঁচটা ঘাই। প্রতিটি বিত্তির শীর্ষদেশে বা মাথার উপর মাছ সংগ্রহ করার জায়গা থাকে। যেখানে হাত ভরে মাছ সংগ্রহ করা হয়। বিত্তির একটা খিলের সঙ্গে আরেকটা খিলের দূরত্ব দুই-তিন মিলিমিটার মতো। আবার ঘাইয়ের অংশটি ইঞ্চি খানেক উন্মুক্ত। যেখানে মাছ অনায়াসে ঢুকে যায়, কিন্তু বেরোতে পারেনা।

বিত্তি বুনতে বা বাঁধতে গেলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দরকার হয়। এসব লোকযন্ত্র তৈরীর লোকপদ্ধতি খুব একটা সোজা নয়। দা দিয়ে খিল কাটা, মসৃণ করা, পা দিয়ে খিল ঘষা, এক সাইজের খিল বা পাত্তি কাটা বেশ কষ্টসাধ্য, অনুশীলন নির্ভর। দীর্ঘ অনুশীলনের পর তা আয়ত্ব হয়। আবার খিল বা পাত্তিকে দড়ি (কখনও তালগাছের আঁশ বা শ্যামলতা) দিয়ে বাঁধাও শিক্ষার দাবি রাখে। একটা খিলের সঙ্গে আরেকটা খিলকে গিঁট দিয়ে বাঁধা হয় না। দড়িকে জড়িয়ে জড়িয়ে গিঁট না বেঁধে খিলের সিরিজ তৈরী করা হয়। এসব কাজ যে রীতিমতো বঙ্গীয় গ্রামীণ শিল্পের অংশ সেটা আমরা অনেকেই জানিনা। বা জানলেও তাকে কুটির শিল্পের মান্যতা দিতে আমাদের অনীহা। ডাহাপাড়ার আমগাছ ঘেরা মনোরম গ্রামে এদের খবর কভার করতে এসেছে সংবাদ মাধ্যম বা ইউটিউব চ্যানেল। কিন্তু এদের শিল্পী হিসাবে মর্যদা দেবার আওয়াজ কেও সেভাবে তোলেনি। গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে এরকম বহু কুটির শিল্প আছে যা দিনদিন হারাতে বসেছে। অথচ তাদের সংরক্ষণ, মান্যতা, উৎসাহ প্রদানের কাজটা আজও শুরু হয়নি। সে কারনেই তারা কাজটা করছে শুধু আয়ের নিরিখে। শিল্পের যে গ্রামীণ ধারাকে তারা বয়ে নিয়ে চলেছে সে বিষয়ে এসব নাম না জানা কারিগররা আজও উদাসীন।

এদের কারিগরি বিদ্যা দেখলে, হাতের গতি দেখলে, বুননের ক্ষিপ্রতা দেখলে অবাক হতে হবে। তারপর বহু কষ্টে দিন দুই টানা পরিশ্রমের পর যে বিত্তি গড়ে উঠবে তা দেখলে থমকে যেতে হয়। অতিসূক্ষ্ম বাঁশ কাঠির খাঁচা, যেখানে চুনোপুঁটিও আটকে যাবে তার দৃষ্টি নান্দনিকতা যে কোনও গবেষকের চোখ টানবেই টানবে।

পলুই বা পলই হলো অনেকটা শঙ্কু আকৃতির। কিছুটা ডিম্বাকার। নিচেরটা বৃত্তাকার। উপরের দিক ছোট হতে হতে আরও ছোট বৃত্তাকার অংশে শেষ হয়। উপরের ওই বৃত্তাকার ফাঁকা জায়গায় হাত ভরে মাছ ধরা হয়। পলই দিয়ে বড় মাছ ধরা হয়। যে কোনও জলাশয়ে মাছ দেখতে পেলে তার উপর পলই চাপা হয়। তারপর উপরের জায়গা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ধরা হয় মাছ। সুন্দরবন নদীয়া এলকায় পলুইয়ের ব্যবহার বেশি। গ্রাম বাংলায় পুকুরে মাছ ধরার কাজেও পলই/পলুই ব্যবহার করা হয়। পলই তৈরী করতে লাগে বাঁশ। তবে বাঁশের যে কাঠি তৈরী করা হয় তা অনেকটা মোটা ও দীর্ঘ। গাছের ছাল, বেত বা শ্যাললতা দিয়ে সেসব কাঠিকে বাঁধা হয়। দেওয়া হয় বিশেষ আকৃতি। উপরের ছবিতে একেবারে ডানদিকের লোকযন্ত্রটি হল পলই বা পলুই। একটা পলই বুনতে দিন দুই সময় লাগে। বিক্রি করলে দাম মেলে তিনশ টাকার মতো। বিত্তি বা জাখোই-এর দামও তিনশোর ধারেকাছে। পলুই ঘাড়ে গ্রামবাংলার মৎস্যজীবি বা সাধারণ গৃহস্থ মানুষ আজও খাল বিলে মাছ ধরে। আবার পুরুষের সঙ্গে সেসব পলুই তৈরী করে পিঙ্কি সরকার, পূর্ণিমা সরকার, লিপিকা সরকারের মতো ঘরের বউ বা বাড়ির মেয়েরা। এরা সবাই দা কাটারি চালাতে পারে। বাঁশকে কাঙ্ক্ষিত সাইজে কাটতে পারে। পেরেক পুঁতে বাঁশকাঠিকে সমান করে মাদুরের মতো বুনতে পারে। এরা কখনও কখনও বানায় জাখোই। যদিও জাখোই বানানোর রেওয়াজ বর্তমানে কিছটা কমেছে। জাখোই হল বাঁশ, বাঁশের ছাল/লীল বা শ্যামলতা দিয়ে বানানো মাছ ধরার লোকসরঞ্জাম। দেখতে ত্রিভুজাকার। উপরের ছবিতে মাঝের লোকযন্ত্রটি হল জাখোই। এই ত্রিভুজাকার জাখোই এর সামনের দিকটি সম্পর্ণ উন্মুক্ত। পিছনের দিকটি বাঁশের ছোট ছোট কাঠি দিয়ে ঘনপিনদ্ধ করে বাঁধা। যার ভিতর দিয়ে জল চলে যেতে পারে, কিন্তু আটকে যায় মাছ। জাখোই দিয়ে জলাশয় থেকে জল ছেঁকে মাছ সংগ্রহ করতে আজও দেখা যায়। জাখোই-এর সামনে থাকে মোটা একটা বাঁশের দণ্ড। যা হাতলের কাজ করে। আবার সংগৃহিত মাছ রাখার জন্য তৈরী করা হয় বাঁশের একটি পাত্র। যা দেখতে অনেকটা গলা মোটা কলসী বা কুঁজোর মতো। যাকে বলা হয় খলই বা খাড়ুই। এটাও মেয়েরা তৈরী করতে পারে। অথচ নিয়তি সরকার বা লিপিকা সরকারের মতো দক্ষ বাঁশশিল্পীরা থেকে যাই আড়ালে। তাদের সন্ধান রাখে কজন!

গ্রামীন লোকযন্ত্রের একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে নানা লোকযন্ত্র ব্যবহার করার ধারা। যন্ত্রগুলি তৈরীর যে প্রযুক্তি তাও যে বহু প্রাচীন তা নির্মাণকৌশল দেখলেই বোঝা যায়। কেননা সেখানে আধুনিক

যন্ত্রের কোনও ব্যবহার নেই। গোটা প্রযুক্তিটাই হস্তনির্ভর। প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেই আগেকার মানুষ মাছ শিকার করত। আবার ওই প্রাকৃতিক সামগ্রী দিয়েই নানা লোকযন্ত্র আজও তৈরী করা হয়। এ থেকে অনুমান করা সহজ এসব লোকবিদ্যার একটা অতীতকথা আছে। যা নিয়ে গবেষণার একটা ক্ষেত্র তৈরী হতে পারে। আলিপুরদুয়ার জেলার পার্বত্য জনজাতির মাঝেও এরকম লোকযন্ত্রের ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন ওখনের মেচ জনজাতি। মেচ জনজীবনে আবার মাছ ধরার নৃত্যগান আছে। যাকে বলা হয় 'নাগুর নাই'। মেচ আদিবাসীরা বাঁশ দিয়ে তৈরী মাছ ধরার যন্ত্রকে বলে জাখৈই। বাঁশ নির্মিত মাছ রাখার পাত্রকে বলে খলাই। নদীয়া মুর্শিদাবাদ বীরভূম প্রভৃতি জেলায় মাছ রাখার পাত্রকে বলা হয় খালুই বা খাড়ুই। যা বাঁশ দিয়ে তৈরী। এসব লোকযন্ত্রের মধ্যে নামসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন জাখোই বা জাখৈই। খলাই, খালুই বা খাড়ুই। আবার আদিবাসী টোটো সমাজে দেখা যায় বাঁশ নির্মিত মাছ ধরার নানা লোকযন্ত্র। যেমন— টিপাই (অনেকটা বিত্তির মতো), ছাপানি (অনেকটা পলুই-এর মতো), ঢোকসে (শঙ্কু আকৃতি বিশিষ্ট কিছুটা লম্বা)। বাংলাদেশে বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হয় চাঁই, পরান, পলো/পাঁলুই, বুছনা নামের ফাঁদ। এ থেকে প্রমাণিত হয় এসব লোকযন্ত্র তৈরীর একটি অতীতকথা অবশ্যই আছে। হাতের কারিগরি বিদ্যার প্রাচীন নমুনা ওসব। যা তৈরী করতে পুরুষের সঙ্গে মহিলারাও সমান পারদর্শী। এসব লোকবিদ্যাকে সংরক্ষণ না করলে তা অচীরে লুপ্ত হবে। শিল্পীর সঙ্গে গ্রাম্য কারিগরি বিদ্যার বিনাশ ঘটবে। সরকারী মৎস দপ্তর এদিকে একটু মনোযোগী হলে শিল্প ও শিল্পীর উদ্বর্তন ঘটবে। উপযুক্ত বিপননের বাজার ধরাতে পারলে তারা আয়ের মুখ দেখবে। নতুবা ভবিষ্যতে এসব হস্তশিল্পের নমুনা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে!